জাতীয় স্মৃতিসৌধ

বাঙালি জাতির রয়েছে রুখে দাঁড়ানোর ইতিহাস। কোনোবারই তারা পিছপা হয়নি। শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোই চৈত্রমাসের খরায় পোড়া মাটির মতো শক্ত পাচিল তুলে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দাঁড়িয়েছে রাজপথে। ৫২, ৫৪, ৬৯, ৭১ সে কথাই বলে। শেষবার এদেশের মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছিল সশস্ত্র পাকিস্তানি হায়নাদের বিরুদ্ধে। দেশ মাতৃকাকে মুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে রণাঙ্গনে ঢেলে দিয়েছিল তাজা রক্ত। ১৬ ডিসেম্বর তিরিশ লাখ শহীদের রক্তের সাগর পেরিয়ে আসে স্বাধীনতা। স্বাধীনতার নেপথ্যে থাকা শহীদের আত্মত্যাগ ভুলে যায়নি মানুষ। সাভারের নবীনগরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা জাতীয় স্মৃতিসৌধটি আজও তাদের কথা জানান দিচ্ছে। হাসান নীলের প্রতিবেদন

শুরুর গল্প

শহীদদের সম্মানার্থে নির্মিত হয়েছিল স্মৃতিসৌধ। যেটি শুরু হয়েছিল হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর রাজধানী শহর থেকে ২৫ কিমি দূরে ঢাকা মহাসড়কের পাশে সাভারের নবীনগর এলাকায় স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি। পরে ১৯৭৮ সালে এটি নির্মাণের উদ্যোগ নেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। সে বছর সৌধটি নির্মাণের জন্য নকশা আহ্বান করা হয়। জমা পড়ে ৫৭টি নকশা। সেবছরের জুনে নকশা বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পরের বছরই নির্বাচিত নকশা অনুযায়ী শুরু হয় নির্মাণকাজ। ৩ বছর ধরে নির্মাণ করা হয় এই সৌধ।

তিন ধাপে নির্মিত হয়েছে স্মৃতিসৌধ

১৯৮২ সালের ১৬ ডিসেম্বরের ঠিক আগে আগে শেষ হয় এর নির্মাণ কাজ। স্মৃতিসৌধের নির্মাণ কাজটি সম্পন্ন হয়েছে তিনটি ধাপে। ১৯৭২ সালে জমি অধিগ্রহণ ও সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে প্রথম ধাপ সম্পন্ন হয়। এতে খরচ হয়েছিল ২৬ লাখ টাকা। ১৯৭৪ সালে শুরু হয় নির্মাণ কাজের দ্বিতীয় ধাপ। এ পর্যায়ে কাজ চলে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত। দ্বিতীয় ধাপে নির্মাণ করা হয় গণকবর এলাকা, হেলিপ্যাড, গাড়ি পার্কিংয়ের স্থান ও চত্বর। এতে ব্যয়ের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় তিন কোটি ৭৭ লাখ টাকা। সে বছরই শুরু হয় স্মৃতিসৌধের তৃতীয় ধাপ তথা শেষ ধাপের কাজ। এ পর্যায়ে মূল স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। মুল অংশটি নির্মাণে খরচ হয় ৮৪৮ লাখ ৬৫ হাজার টাকা। পাশাপাশি কৃত্রিম লেক, সবুজ বেষ্টনী, ক্যাফেটেরিয়া, রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য আবাসিক এলাকাও নির্মাণ করা হয়। সবমিলিয়ে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয় ১৯৮৮ সালে। এতে তিন ধাপে মোট খরচ হয় ১৩ কোটি টাকা।

স্মৃতিসৌধের বিশেষত্ব

জাতীয় স্মৃতিসৌধটি মূলত সাতটি ফলক নিয়ে তৈরি একটি সৌধ। এর প্রতিটি স্তম্ভের রয়েছে আলাদা বিশেষত্ব। বিষয়টি অনেকেরই অজানা। একটু কাছে গিয়ে ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যায়, স্মৃতিসৌধটি মূলত সাত জোড়া ত্রিভুজ নিয়ে গঠিত। যা দিয়ে বাংলাদেশের জন্মের সাতটি পর্যায় বোঝানো হয়েছে। এগুলো হলো ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। এই সাতটি ঘটনাকে বাংলাদেশ সৃষ্টির ধারাবাহিক ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একেবারে শেষ ধাপে রাখা হয় মুক্তিযুদ্ধকে। এই ধাপটিকে চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

যা বলছে স্মৃতিসৌধ

স্মৃতিসৌধে ঢুকলে শুরুতেই চোখে পড়বে শ্বেত পাথরে লেখা 'বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা, এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলোয় হবে হারা'। শহীদের আত্মত্যাগের উদ্দেশে লেখা লাইন দুটির ঠিক সামনেই রয়েছে ভিত্তিপ্রস্তর। এটিও শ্বেতপাথরে নির্মিত। ভিত্তিপ্রস্তরের ডান পাশে পড়বে উন্মুক্ত মঞ্চ। মঞ্চের সৌন্দর্য বেশ নজর কাড়া। যা আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও থামিয়ে দেবে। কিছু সময় থেমে উপভোগ করুন মঞ্চ। এরপর সোজা সামনের দিকে কিছুটা পথ এগিয়ে যেতে হবে। এই পথটায় উঁচু নিচু বেশকিছু চত্বর রয়েছে। এই চত্বরগুলো পার হতে হলে কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে বেশ কয়েকবার ওঠা নামা করতে হয়। এরপর সামনে রয়েছে একটি কৃত্রিম জলাশয়। ওই জলাশয়ের ওপর একটি সেতুও রয়েছে। সেই সাঁকো বেয়ে জলাশয় পেরিয়ে যে পথ রয়েছে তার দুই পাশে সারি সারি গণকবর। ওই পথে হেঁটেই আপনাকে পৌঁছাতে হবে স্মৃতিসৌধের মূল অংশে। এদিকে যে চত্বর ও সিঁড়ি পাড়ি দিয়ে আপনি সৌধে পৌঁছালেন খেয়াল করে দেখবেন সেগুলো লাল রঙের ইটে তৈরি। ভাবতে পারেন, নান্দনিকতার জন্যই এই আয়োজন। বিষয়টি তেমন না। এই জায়গার রঙ, রাস্তা, জলাশয়, প্রতিটি চত্বর এবং সিঁড়ি একেকটি অর্থ বহন করে। সিড়ি ও ছোটবড় চত্বর ও দীর্ঘ হাঁটা পথ, সাঁকোর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে, বিজয়প্রাপ্তির এই পথ মোটেও মসৃণ ছিল না। বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা অর্জনে যে রক্ত দেওয়া হয়েছে লাল ইটের মাধ্যমে সেটাই বোঝানো হয়েছে। আর জলাশয়টি অশ্রুর প্রতীক। এরপরই বিশেষ অর্থ বহন করে দাঁড়িয়ে আছে সাতটি স্তম্ভ নিয়ে নির্মিত স্মৃতিসৌধের মূল অংশ। সাতটি ফলক বিশিষ্ট এই অংশটির উচ্চতা ১৫০ ফুট বা ৪৫ মিটার।

স্মৃতিসৌধের প্রতিটি নির্মাণ শৈলী বিশেষ অর্থ বহন করে। তা ইট হোক আর রঙ হোক। খেয়াল করলে দেখবেন, স্মৃতিসৌধের মূল অংশটুকু কংক্রিটের তৈরি। কমপ্লেক্সের বাকি অংশটুকু মইনুল হোসেন নির্মাণ করেছেন লাল ইটে। মূল অংশের স্বকীয়তা বজায় রাখতেই রাখা হয়েছে এই ভিন্নতা। এর দ্বারা রক্তলাল জমিনের বুকে স্বাধীনতার প্রকাশ ঘটেছে। সব মিলিয়ে ৩৪ হেক্টর জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্মৃতিসৌধ। এর বাইরে আরও ১০ হেক্টর জায়গা জুড়ে রয়েছে ঘাসের বেষ্টনী। যা দ্বারা বোঝানো হয়েছে বাংলাদেশের সবুজ শ্যামলিমাকে।

স্মৃতিসৌধের সৌন্দর্যে মুগ্ধ সবাই

২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর এমন বিশেষ দিনগুলোতে জনতার ঢল নামে স্মৃতিসৌধে। জাতীয় বীরদের শ্রদ্ধা জানাতে এখানে আসেন তারা। এছাড়া বিভিন্ন দেশ থেকে আগত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাও দেশের সূর্যসন্তানদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এখানে আসেন। স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে রোপণ করেন বিভিন্ন গাছের চারা। এ সময় এর সৌন্দর্য মুগ্ধ করে তাদের। এছাড়া অন্যান্য দিনগুলোতে দশনার্থীদের ভিড় লেগে থাকে স্মৃতিসৌধে। কেউ যান শহীদের আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান দেখিয়ে নির্মিত এই সৌধ দেখতে। আবার কেউ কেউ যান শহুরে যান্ত্রিকতা থেকে একটু নিজেকে আড়াল করতে। এর একমাত্র কারণ এই সৌধের সৌন্দর্য।

স্মৃতিসৌধে গিয়ে যা করা অনুচিত

স্মৃতিসৌধে গিয়ে অনেকেই হয়ে ওঠেন জায়গাটি নোংরা করার কারণ। যা একেবারেই অনুচিত। সেকারণেই এখানে গিয়ে চিপস, চকলেট, বাদামের খোসা বা পরিত্যক্ত বর্জ্য যত্রতত্র ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে। অনেকে আবার পাশ দিয়ে হেঁটে ফলকে ওঠার চেষ্টা করেন। এটা একেবারেই অনুচিত। কেননা শহীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক নির্মিত এ সৌধের ফলকের ওপর ওঠার চেষ্টা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

সৈয়দ মইনুল হোসেনের কথা

স্মৃতিসৌধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এর নকশাকার সৈয়দ মইনুল হোসেনের নাম। তিনি ১৯৫২ সালের ৫ মে মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়ির দামপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা মুজিবুল হক ছিলেন ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যাপক। ছোটবেলা থেকেই মইনুলের ইচ্ছা ছিল প্রকৌশলী হওয়ার। এ লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্য নিয়ে যখন ঢাকা আসেন তখন দেশ মাতৃকা বিপন্ন প্রায়। চারদিকে বাজছে যুদ্ধের দামামা। এমন একটি সময়ে ১৯৭০ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্যবিদ্যা বিভাগে ভর্তি হন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সোহরাওয়ার্দী ছাত্রাবাসে সিটও পেয়ে যান। তবে বেশিদিন থাকা হয়নি সেখানে। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের জনজীবন এলোমেলো হয়ে ফরিদপুর চলে যেতে হয় তাকে। যুদ্ধ শেষ হলে মইনুল ফিরে আসেন। ১৯৭৬ সালে স্নাতক সম্পন্ন করেন তিনি। স্নাতক হওয়ার দুই বছর পরই হাতে নিয়েছিলেন স্মৃতিসৌধের কাজ। সে সময় ২৬ বছরের যুবক তিনি। ওই বয়সে স্মৃতিসৌধের নকশা করে ১৭-১৮ জনকে টপকে প্রথম পুরস্কার জিতে নেন তিনি। এ পুরস্কার বাবদ ২০ হাজার টাকা পেয়েছিলেন মইনুল হোসেন। মইনুল হোসেনের কর্মজীবনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তার নকশায় নির্মিত হয়েছে আরও বেশ কিছু স্থাপনা। এরমধ্যে IRDP ভবন কাওরানবাজার, ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ভবন, চট্টগ্রাম ইপিজেড, বাংলাদেশ চামড়াজাত প্রযুক্তির কর্মশালা ভবন, উত্তরা মডেল টাউন, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার খাদ্য গুদামের নকশা, কফিল উদ্দিন প্লাজা, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস ভবন উল্লেখযোগ্য।